০২-১০-২০২০ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

***প্রশ্নঃ -** কোন্ কথা চিন্তা করলে অথবা বললে, এই জ্ঞানমার্গে কখনো উন্নতি হতে পারে না ?*

***উত্তরঃ -** ড্রামাতে থাকলে ঠিক পুরুষার্থ করে নেব, ড্রামা যদি করিয়ে নেয়, তাহলে পুরুষার্থ করব - যারা এইরকম চিন্তা করে কিংবা কথাবার্তা বলে, তাদের কখনো উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। এইরকম বললে তো ভুল বলা হয়। তোমরা জানো যে এখন আমরা যেমন পুরুষার্থ করছি, সেটাও ড্রামাতেই আছে। পুরুষার্থ তো করতেই হবে।*

***গীতঃ-** এটা একটা প্রদীপ আর ঝড়ের কাহিনী...*

ওম্ শান্তি। এটা কলিযুগের মানুষের গান। কিন্তু ওরা এই গানের প্রকৃত অর্থ জানে না, কিন্তু তোমরা জানো। তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ নিবাসী। সঙ্গমযুগের সঙ্গে পুরুষোত্তম শব্দটাও লিখতে হবে। জ্ঞানের পয়েন্টগুলো মনে না থাকার জন্য বাচ্চারা এইরকম শব্দগুলো লিখতে ভুলে যায়। এই শব্দটাই মুখ্য, যার অর্থ কেবল তোমরাই বুঝতে পারো। পুরুষোত্তম মাস তো প্রচলিত রয়েছে। এটা হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এই সঙ্গমযুগটাও একটা পার্বন। এটা হল সর্বশ্রেষ্ঠ পার্বন। তোমরা জানো যে, এখন আমরা পুরুষোত্তম হচ্ছি। অর্থাৎ সর্বোত্তম পুরুষ। সবথেকে ধনী ব্যক্তির থেকেও ধনী, এক নম্বর সম্পদশালী হলো লক্ষ্মী - নারায়ণ। শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে যে বিশাল প্রলয় হয়েছিল। তারপর সবার প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ সাগরের মধ্যে অশ্বত্থ পাতায় ভেসে এসেছিলেন। তোমরা এখন কি বলবে ? শ্রীকৃষ্ণই হলো নম্বর ওয়ান, যাকে শ্যামসুন্দর বলা হয়। দেখানো হয়েছে যে তিনি মুখে আঙ্গুল দিয়ে ভেসে ভেসে এসেছেন। সন্তানের জন্ম তো গর্ভ থেকেই হয়। সুতরাং, শ্রীকৃষ্ণ হলেন জ্ঞানের সাগর থেকে সর্বপ্রথম জন্ম নেওয়া সর্বোত্তম পুরুষ। জ্ঞানের সাগরের দ্বারা-ই স্বর্গ স্থাপন হয়। তাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ হলেন নম্বর ওয়ান পুরুষোত্তম। আর ইনি হলেন জ্ঞানের সাগর, জলের সাগর নন। একেবারে প্রলয় তো হবে না। কিছু কিছু নতুন বাচ্চা আসতেই থাকে। তাই পুরাতন পয়েন্টগুলো বাবাকে রিপিট করতে হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি - এই চারটে যুগ তো আছেই। পাঁচ নম্বর যুগ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এই যুগেই মানুষের পরিবর্তন হয়। অধম থেকে সর্বোত্তম হয়ে যায়। শিববাবাকেও পুরুষোত্তম বা সর্বোত্তম বলা হয়। তিনি হলেন পরম আত্মা বা পরমাত্মা। ওনার পরে সকল আত্মার (পুরুষ) মধ্যে উত্তম হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। এনাদেরকে কে এইরকম বানিয়েছেন ? এই প্রশ্নের উত্তর তো তোমরা বাচ্চারাই জানো। বাচ্চারাও বুঝেছে যে বর্তমান সময়ে আমরা এইরকম হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। খুব কঠিন পুরুষার্থ নয়, একদম সিম্পল। যারা শিক্ষাগ্রহণ করছে, তারা কেউ অবলা, কেউ কুঁজো, কেউ আবার একটুও লেখাপড়া শেখেনি। তাদের জন্য অনেক সহজভাবে বোঝানো হয়। আমেদাবাদের একজন সাধু বলতো যে সে নাকি কিছুই খায় না। আচ্ছা, কেউ যদি সারা জীবন ধরে না খায়, তাহলে তার প্রাপ্তি কি হবে ? কিছুই নয়। বৃক্ষেরও পুষ্টির প্রয়োজন হয়, যেগুলো সে সার এবং জলের দ্বারা প্রাকৃতিক ভাবে পেয়ে যায় এবং তার ফলে বৃদ্ধি হতে থাকে। তিনি হয়তো কোনোও ঋদ্ধি-সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এমন অনেকেই আছে যারা জলের উপর দিয়ে, আগুনের উপর দিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এইসব করে কি লাভ ? তোমাদের এই সহজ রাজযোগের দ্বারা তো জন্ম জন্মান্তরের লাভ হয়ে যায়। তোমাদের অনেক জন্মের জন্য দুঃখী থেকে সুখী বানানো হয়। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, ড্রামা অনুসারে আমি তোমাদেরকে অনেক সূক্ষ্ম বিষয় বলছি।

যেমন, বাবা বুঝিয়েছেন যে ওরা কেন শিব এবং শঙ্করকে মিলিয়ে দিয়েছে ? *শঙ্করের তো এই দুনিয়ায় কোনো ভূমিকাই নেই। শিববাবার, ব্রহ্মার এবং বিষ্ণুর ভূমিকা রয়েছে।* ব্রহ্মা অথবা বিষ্ণুর তো অলরাউন্ড ভূমিকা আছে। শিববাবার কেবল এইসময়েই ভূমিকা রয়েছে। তাই তিনি এসে জ্ঞান শোনাচ্ছেন। তারপর পুনরায় নির্বাণধামে চলে যাবেন। সন্তানদেরকে সম্পত্তি দেওয়ার পর নিজে বাণপ্রস্থে চলে যান। বাণপ্রস্থে যাওয়ার অর্থ হলো গুরুর সাহায্য নিয়ে বাণীর থেকেও ওপরে যাওয়ার চেষ্টা করা। কিন্তু এখন সবাই বিকারগ্রস্ত এবং দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে গেছে, তাই কেউই ফেরত যেতে পারবে না। সকলেই বিকারের দ্বারা জন্মগ্রহণ করে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ নির্বিকার ছিলেন। ওনাদের বিকারের দ্বারা জন্ম হতো না। তাই শ্রেষ্ঠাচারী বলা হতো। *সুতরাং, বাবা বুঝিয়েছেন যে, এই দুনিয়ায় শঙ্করের কোনো ভূমিকাই নেই। তবে প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো অবশ্যই প্রজাদের পিতা। আর শিববাবা হলেন সকল আত্মার পিতা।* তিনি আমাদের অবিনাশী পিতা। এই অতি সূক্ষ্ম বিষয়গুলো ভালো ভাবে ধারণ করতে হবে। যারা বড় বড় দার্শনিক, তারা কতো উপাধি পায়। যেমন অনেক বিদ্বান-পন্ডিত শ্রীশ্রী ১০৮ উপাধি পেয়ে থাকে। বেনারসের কলেজ থেকে পাস করে টাইটেল নিয়ে আসে।

বাবা তো সেইজন্যই গুপ্ত মহাশয়কে বেনারসে পাঠিয়েছিলেন, যাতে ওদেরকে বোঝানো যায় যে, ওরা কিভাবে বাবার উপাধিকে নিজেরা ধারণ করে নিয়েছে। বাবাকেই শ্রীশ্রী ১০৮ জগৎ গুরু বলা হয়। ১০৮-এর মালাও হয়। অষ্টরত্নেরও গায়ন আছে। ওরাই সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ন হয়। তাই ওদের মালা বানিয়ে জপ করা হয়। তারপরে ১০৮-এর মালাকে একটু কম পূজা করা হয়। যজ্ঞের সময়ে কেউ হাজার শালিগ্রাম বানায়, কেউ দশ হাজার বানায়, কেউ পঞ্চাশ হাজার বানায়, কেউ আবার এক লক্ষও বানায়। মাটি দিয়ে এইরকম বানিয়ে তারপর যজ্ঞ রচনা করে। যারা অনেক বড় শেঠ (ধনী ব্যক্তি), তারা এইরকম লক্ষ লক্ষ বানায়। বাবা বুঝিয়েছেন যে মালা তো অনেক বড়। ১৬ হাজার ১০৮-এর মালাও বানানো হয়। তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকেই বাবা এইসব বিষয় বসে থেকে বোঝাচ্ছেন। বাবার সঙ্গে তোমরাও ভারতের সেবা করছ। তাই বাবার পূজা হলে, বাচ্চাদেরও পূজা হওয়া দরকার। মানুষ জানে না যে, রুদ্র পূজা আসলে কি ? সবাই তো শিববাবার সন্তান। এখন গোটা বিশ্বের জনসংখ্যা কত বৃদ্ধি পেয়েছে। এরা সকলেই শিববাবার সন্তান। কিন্তু সকলে তো সহযোগী নয়। এখন তোমরা যত বেশি স্মরণ করবে, তত ভালো পদ পাবে এবং সেই অনুসারেই পূজনীয় হবে। অন্য কারোর মধ্যে এইরকম শক্তি নেই যে এইসব বিষয় বোঝাবে। তাই ওরা বলে দেয় যে ঈশ্বরের অন্ত পাওয়া সম্ভব নয়। বাবা এসেই এইসব বোঝান। বাবাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। সুতরাং তিনি এসে নিশ্চয়ই জ্ঞান শোনাবেন। কেবল প্রেরণা দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। ভগবান কি প্রেরণার দ্বারা শিক্ষা দেন ? তোমরা জানো যে তাঁর কাছে সৃষ্টির আদি, মধ্য এবং অন্তিমের জ্ঞান রয়েছে। তিনি তোমাদেরকে সেগুলো শোনান। এই বিষয়ে তোমরা সুনিশ্চিত। কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার পরেও বাবাকে ভুলে যায়। বাবাকে স্মরণ করাই হলো এই শিক্ষার সার। স্মরণের যাত্রার দ্বারা কর্মাতীত অবস্থা পাওয়ার জন্যই পরিশ্রম করতে হয়। এই ক্ষেত্রেই অনেক মায়াবী বিঘ্ন আসে। পড়াশুনার ক্ষেত্রে এতো বিঘ্ন আসে না। শঙ্করের সম্বন্ধে বলা হয় যে শঙ্কর নাকি চোখ খুললেই বিনাশ হয়ে যায়। কিন্তু এটাও তো সঠিক নয়। *বাবা বলছেন, আমিও বিনাশ করাই না, আর শঙ্করও বিনাশ করে না।* কোনো দেবতা কিভাবে পাপ করবে ? শিববাবা নিজে বসে থেকে এইসব বিষয় বোঝাচ্ছেন। এই শরীরটা হলো আত্মার রথ। প্রত্যেক আত্মাই নিজের নিজের রথে চেপে আছে। বাবা বলছেন, আমি এনার শরীরটা লোন নিই, তাই আমার জন্মকে দিব্য এবং অলৌকিক বলা হয়। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন ৮৪ চক্রের কাহিনী রয়েছে। তোমরা জানো যে এখন আমরা বাড়ি যাব এবং সেখান থেকে স্বর্গে আসব। বাবা খুব সহজ ভাবে বোঝাচ্ছেন। এক্ষেত্রে হার্টফেল হলে চলবে না। অনেকে বলে - বাবা, আমি তো লেখাপড়া জানি না, কিছুই বলতে পারি না। কিন্তু এইরকম তো হওয়ার কথা নয়। অন্যদেরকে কিছু না কিছু তো বলতেই হবে। খাওয়ার সময়েও মুখের ব্যবহার হয়। তাহলে কথা বলতে পারবে না কেন ? বাবা অনেক সহজভাবে বুঝিয়েছেন। কেউ কেউ নীরব থেকেও উপরের দিকে ইশারা করে বুঝিয়ে দেয় যে ওনাকে স্মরণ করো। তিনি দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করেন। কেবল তিনিই সুখ দেন। ভক্তির সময়েও তিনি দাতা এবং এখনো তিনি দাতা। বাণপ্রস্থে তো কেবল শান্তি আর শান্তি। বাচ্চারাও শান্তিধামে থাকে। যার যেমন পার্ট আছে, সে সেইরকম ভূমিকা পালন করে। *এখন আমাদের পার্ট হলো - বিশ্বকে পুনরায় নতুন বানানো।* ওনার নামও খুব সুন্দর - হেভেনলি গড ফাদার। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। বাবা কি কখনো নরক রচনা করবেন ? কেউ কি কখনো পুরাতন জিনিস তৈরি করে ? সর্বদাই নতুন বাড়ি বানানো হয়। শিববাবাও ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়ার রচনা করেন। এটাই ওনার ভূমিকা। এখানে পুরাতন দুনিয়ায় যত মানুষ আছে, সকলেই পরস্পরকে দুঃখ দেয়।

তোমরা জানো যে, আমরা হলাম শিববাবার সন্তান এবং শরীরধারী প্রজাপিতা ব্রহ্মার দত্তক নেওয়া সন্তান। রচয়িতা অর্থাৎ শিববাবা আমাদেরকে জ্ঞান শোনান। তিনি নিজের রচনার আদি, মধ্য এবং অন্তিমের জ্ঞান শোনান। তোমাদের লক্ষ্য হলো এইরকম হওয়া। মানুষ কত টাকা খরচ করে মার্বেল পাথরের মূর্তি বানায়। এটা ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি। সমগ্র ইউনিভার্সকে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়। সকলের স্বভাব এখন অসুরের মতো হয়ে গেছে। আদি, মধ্য, অন্ত কেবল দুঃখই দেয়। এটা ঈশ্বরীয় ইউনিভার্সিটি। ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় তো একটাই হয় যেটা স্বয়ং ঈশ্বর এসে প্রতিষ্ঠা করেন। এর দ্বারা সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমরা এখন ঠিক-ভুলের জ্ঞান পাচ্ছ। অন্য কোনো মানুষ এগুলো বোঝে না। ঠিক-ভুলের জ্ঞান বোঝানোর ক্ষমতা কেবল একজন ধার্মিকের আছে, যাকে ' সত্য' বলা হয়। তিনি এসে সবাইকে ধার্মিক বানিয়ে দেন। প্রকৃত ধার্মিক হলেই, মুক্তিধামে যাওয়ার পর জীবনমুক্তিতে আসতে পারবে। তোমরা বাচ্চারা তো এই ড্রামাকেও জেনেছ। অভিনয় করার জন্য আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ক্রমানুসারে আসতে থাকো। এই খেলাটা চলতেই থাকে। ড্রামাও প্রতি মুহূর্তে রেকর্ড হতে থাকে। এই ড্রামা সদাই নতুন, কখনোই পুরাতন হয় না। অন্যান্য নাটক তো শেষ হয়ে যায়। এটা সীমাহীন অবিনাশী নাটক। এখানে প্রত্যেকের অবিনাশী ভূমিকা রয়েছে। দেখেছ, কত সুবিশাল এই অবিনাশী খেলা এবং এই অবিনাশী মঞ্চ। বাবা এসে পুরাতন দুনিয়াকে পুনরায় নতুন বানান। ভবিষ্যতে দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে তোমরা সব কিছু দেখতে পাবে। যত সময় এগিয়ে আসবে, তত তোমরা খুশি হবে, দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে দেখতে পাবে। তখন তোমরা বলবে - এবার অভিনয় শেষ হয়েছে। এখন এই ড্রামা আবার রিপিট হবে। যারা আগের

কল্পেও ছিল, তারা পুনরায় প্রথম থেকে অভিনয় শুরু করবে। এক্ষেত্রে একটুও তফাৎ হওয়া সম্ভব নয়। তাই বাচ্চারা, যতটা সম্ভব উঁচু পদ পেতে হবে। পুরুষার্থ করতে হবে। সংশয় প্রকাশ করা উচিৎ নয়। ড্রামা যা করানোর সেটাই করাবে - এইরকম কথা বলাও ঠিক নয়। আমাদেরকে অবশ্যই পুরুষার্থ করতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পড়াশুনার সার কথাকে বুদ্ধিতে রেখে স্মরণের যাত্রার দ্বারা কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে। শ্রেষ্ঠ, পূজনীয় হওয়ার জন্য বাবার সম্পূর্ণ সহযোগী হতে হবে।

২) সত্য বাবার কাছ থেকে ঠিক - ভুলের যে জ্ঞান পেয়েছ, সেই জ্ঞানের দ্বারা ধার্মিক হয়ে জীবন বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হবে। মুক্তি এবং জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার নিতে হবে।

বরদানঃ- সঙ্গমযুগের সকল প্রাপ্তিকে স্মরণে রেখে ঊর্ধ্বগামী অবস্থার অনুভবকারী শ্রেষ্ঠ প্রারব্ধী ভব*

পরমাত্ম-মিলন কিংবা পরমাত্ম-জ্ঞানের বিশেষত্ব হলো - অবিনাশী প্রাপ্তি। এমন নয় যে, সঙ্গমযুগ কেবল পুরুষার্থ করার যুগ আর সত্যযুগ হলো প্রারব্ধ পাওয়ার যুগ। সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব হলো এক পদক্ষেপ এগিয়ে যাও আর হাজার পদক্ষেপ প্রারব্ধতে পাও। সুতরাং, কেবল পুরুষার্থী নয়, বরং শ্রেষ্ঠ প্রারব্ধী - নিজের এই স্বরূপকে সর্বদা সামনে রাখো। প্রাপ্তি গুলিকে দেখলে সহজেই ঊর্ধ্বগামী অবস্থার অনুভব করবে। ‘‘পানা থা, সো পা লিয়া’’ - এই গান গাইতে থাকলে ঝিমুনি কিংবা শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার হাত থেকে বেঁচে যাবে।

স্লোগানঃ- সাহস হলো ব্রাহ্মণদের শ্বাস, এর দ্বারা সবথেকে কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়।*

মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য

‘‘মুক্তি এবং জীবনমুক্তি’’

আজকাল মানুষ মুক্তিকেই মোক্ষ বলে দেয়। ওরা ভাবে - যে একবার মুক্তি পেয়ে যায়, তাকে আর জন্ম মৃত্যুর মধ্যে আসতে হয় না। ওরা তো জন্ম মরণে না আসাকেই উঁচু পদপ্রাপ্তি মনে করে, ওটাকেই প্রাপ্তি বলে ভাবে। আর শরীরে থেকে ভালো কর্ম করাকে জীবনমুক্তি মনে করে। তাই বিভিন্ন ধর্মাত্মাকে জীবনমুক্ত মনে করে। কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়টা তো কোটি কোটি মানুষের মধ্যে খুব কমজনই মানে। এগুলো সব ওদের মতামত। কিন্তু আমরা পরমাত্মার কাছ থেকে জেনেছি যে যতক্ষণ মানুষ আগের বিকারগ্রস্ত কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ এই আদি, মধ্য, অন্তিমের দুঃখ থেকেও মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং, এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াটাও একটা অবস্থা। ঈশ্বরীয় জ্ঞানকে ধারণ করলেই এইরকম অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব এবং এইরকম অবস্থায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্বয়ং পরমাত্মাকেই প্রয়োজন, কারন তিনিই আমাদেরকে মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দেন। তিনি কেবল একবার এসে সবাইকে মুক্তি এবং জীবনমুক্তি প্রদান করেন। পরমাত্মা কখনোই অনেক বার আসেন না এবং এটাও ভেবো না যে তিনি এইরকম অবতার বেশ ধারণ করেন। ওম্ শান্তি।